একাত্তরে বাংলাদেশে পাকিস্তানি ‘জেনোসাইড’ ও ‘এথনিক ক্লিনসিং’ - রফিকুল ইসলাম

হাজার বছর আমাদের এই ভূখণ্ড শাসিত হয়েছে বহিরাগতদের দ্বারা। শশাঙ্ক, পাল এবং চন্দ্র বংশের শাসকদের রাজত্বকালের পর কর্ণাটকীয় ব্রাহ্মণ সেন রাজাদের সময় থেকে শুরু বাংলাদেশে বিদেশি শাসন। তুর্কী, পাঠান, মোগল যে নামেই হোক এ দেশে বহিরাগত শাসক ছিল। এমনকি নবাব আলিবর্দিখান ও সিরাজদ্দৌলাও বাঙালি ছিলেন না। আমাদের এ ভূখণ্ড বারবার বহিরাগতদের দ্বারা আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুরা এসেছে সাগরপথে, সন্দ্বীপ দখলে রেখে বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চল তারা বারবার লুন্ঠন, অপহরণ ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে বিরাণমুলুকে পরিণত করে দিয়েছিল। মোগল যুবরাজ শাজাহান পর্যন্ত ঢাকা লুন্ঠন করতে কুন্ঠাবোধ করেননি। পর্তুগীজ ও মগ দস্যুরাও একাধিকবার ঢাকা লুন্ঠন করেছে। মারাঠা দস্যু বর্গীদের লুন্ঠন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মায়েরা বর্গীদের ছড়া শুনিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতেন, ‘ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?’ মোগল উপনিবেশিক আমলে বাংলার ঐশ্বর্য চলে যেত দিল্লীতে। পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভের মুরশিদাবাদ লুন্ঠনের কাহিনী কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭, একশত বছর বাংলা লুন্ঠন করেছে। ইংরেজ আমলে বাংলার ধনসম্পদ দিয়ে শুধু ডান্ডি নয়, লন্ডন শহরের সমৃদ্ধি ঘটেছে আর পাকিস্তানি আমলে পূর্ব বাংলার অর্থ সম্পদ পাচার করে গড়ে তোলা হয়েছে প্রথমে করাচি পরে নতুন রাজধানী ইসলামাবাদ।

আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস বাংলা লুন্ঠনের ইতিহাস, এই লুন্ঠনে মোগল, ইংরেজ ও পাকিস্তানিদের মধ্যে কারা শীর্ষে আমাদের ইতিহাসে তা লেখা নেই। মোগলরা চারশ’ বছরে যে লুন্ঠন করেছে, ইংরেজরা দু’শ’ বছরে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি শোষণ করেছে আর পাকিস্তানিরা মাত্র সিকি শতাব্দীতে লুন্ঠনের যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তা ব্রিটিশ ও মোগলদের হার মানায়। পাকিস্তানিরা অবশ্য যে বিষয়ে ইতিহাস স্থাপন করেছে তা হলো একাত্তর সালে বাংলাদেশে গণহত্যা, নারী নির্যাতন এবং বাঙালি জাতিসত্তা নির্মূলের সর্বাত্নক আগ্রাসন। প্রাচীন বাংলায় সেন রাজত্বকালে বৌদ্ধদের ওপর নির্যাতন এবং ধর্ম পরিবর্তন চলেছে। তুর্কী বিজয়ের পর এদেশে অমুসলমানদের ওপর যে নির্যাতন হয়নি তা বলা যাবে না কিন্তু স্বাধীন সুলতানি আমলে সে প্রক্রিয়া বন্ধ এবং বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্য সুলতানি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। মোগল শাসন ঔপনিবেশিক হলেও মোগলরা শাসক হিসেবে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ; সর্বোপরি স্বাধীন সুলতান এবং মোগল শাসকের দুই আমলের কোনও সময়েই অমুসলমানদের ওপর জাতিগত নিপীড়ন চলেনি বরং হিন্দু.মুসলমান.বৌদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালি জনসাধারণ পাশাপাশি শত শত বছর শান্তিতে বসবাস করেছে। ইংরেজ আমলে বাংলার মানুষ ঔপনিবেশিক শাসনে শোষিত হলেও হিন্দু.মুসলমান.বৌদ্ধ.খ্রিষ্টান নির্বিশেষে বাঙালি এক যৌথ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে। একমাত্র পাকিস্তানি আমলে হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান নির্বিশেষে বাঙালির প্রতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈষম্য কেন্দ্রীয় পাকিস্তানি শাসকদের শাসন ও শোষণের মূল নীতিরূপে অনুসৃত হতে থাকে। হাজার বছরের বাংলার ইতিহাসে পাকিস্তানি আমলের পূর্বে কখনও সামগ্রিকভাবে ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালির ওপর জাতিগত নিপীড়ন চলেনি বরং সুলতানি আমল থেকে শুরু করে ইংরেজ আমলের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু.মুসলমান.বৌদ্ধ.খ্রিষ্টান সমবায়ে বাঙালি জাতি গড়ে ওঠে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, বর্ণমালা, সঙ্গীত,

এককথায় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সকলের অবদানে। ইংরেজ আমলে বাঙালি সংস্কৃতির যে উৎকর্ষ তার সূচনা হয়েছিল স্বাধীন সুলতানি আমলে আর রূপান্তর ঘটেছিল মোগল আমলে।

পাকিস্তানি শাসনামলের সূচনাকাল থেকেই বাংলা ভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য ও সঙ্গীত তথা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক বাংলা ভাষাভাষীদের সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা হতে থাকে। শুধু রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন নয়, বর্ণমালা পরিবর্তনের অপপ্রয়াস, বাংলাদেশের সাহিত্যকে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা, বাংলা সাহিত্যকে পঙ্গুকরণ, বাঙালির চিরায়ত সঙ্গীত ভুলিয়ে দেবার অপপ্রয়াস পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাঙালির যে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয় তা অচিরেই প্রতিরোধ সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। বস্তুত পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকে করাচিতে রাজধানী, রাওয়ালপিন্ডিতে সামরিক সদর দফতর, করাচিতে নৌবাহিনীর এবং পেশওয়ারে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন এবং পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডির কাছে ইসলামাবাদে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসক ও শোষক চক্র সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিকে জানিয়ে দেয় যে, বাঙালি পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক নয়। পাকিস্তান সামরিক.আমলাতন্ত্রের শতকরা নব্বই ভাগ ছিল পাঞ্জাবি বস্তুত পাকিস্তান চরিত্রগত দিক থেকে ছিল পাঞ্জাবীস্তান। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতিকে গোলামের জাতে পরিণত করার জন্যই পঞ্চাশ দশকের শেষে পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক জেনারেল আইয়ুব খান তার 'প্রভু নয় বন্ধু' গ্রন্থে বাঙালিদের 'হাইওয়ান' বা 'জানোয়ার' আখ্যা দিয়েছিলেন। আইয়ুব খানের ওই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের মন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল দেড় হাজার মাইল কিন্তু মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব ছিল লক্ষ যোজন সুতরাং সংঘাত ছিল অনিবার্য।

কিন্তু সংঘাত যে এমন নৃশংস, বর্বর, পৈশাচিক রূপ নেবে তা পাকিস্তানের বাঙালি মাত্রেরই ছিল অকল্পনীয়। একটা দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চল যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের ওপর 'গণহত্যা যজ্ঞ' এবং একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বাত্মক সামরিক আগ্রাসন চালাতে পারে তা ছিল অবিশ্বাস্য। সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির রায়কে পদদলিত করার জন্য পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচার তার আন্তর্জাতিক প্রভুদের মদদে একাত্তর সালে নয় মাস জুড়ে যে মারণ যজ্ঞ, নির্যাতন লীলা, ধ্বংস প্রক্রিয়া চালিয়েছিল তাকে আন্তর্জাতিক পরিভাষায়, 'এথনিক ক্লিনসিং' বা বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য 'জেনোসাইড' বা গণহত্যা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। এ ঘটনা কেবল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের ইহুদি নির্মূল অভিযানের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। তবে পার্থক্য এই যে, হিটলার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছয় বছরে মোট ষাট লাখ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি। আর পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী এবং তার গোলাম রাজাকার, আলবদর প্রভৃতি বাহিনী মাত্র নয় মাসে ত্রিশ লাখ বাঙালি নিধন করেছিল। এত কম সময়ে এত বেশি মানুষ হিটলারও মারতে পারেনি যা পেরেছিল পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল নিয়াজি ও জেনারেল রাওফরমান আলি। নারী নির্যাতনে পাকিস্তানি রেকর্ড জার্মান গেস্টাপো বাহিনীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল কারণ জার্মানরা শুধু ইহুদি রমণীদের ওপর নির্যাতন করেছিল কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের দালালদের সাহায্যে হিন্দু.মুসলমান.বৌদ্ধ.খ্রিষ্টান নির্বিশেষে বাঙালি নারীদের ওপর যে নির্যাতন চালায় তা তুলনীয় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাঞ্জাবের নারী নির্যাতনের বর্বরতার সঙ্গে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাঞ্জাব দু'ভাগে বিভক্ত হয় এবং পাঞ্জাবী মুসলমান ও অমুসলিম (শিখ ও হিন্দু) সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটে তা একমাত্র মধ্যযুগের নৃশংসতার সঙ্গে তুলনীয়। ওই সময়ে সর্বাত্মক দেশত্যাগের প্রক্রিয়ায় পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে কোনও কিশোরী বা তরুণী শিখ বা হিন্দু মেয়েকে পূর্ব পাঞ্জাবে যেতে দেওয়া হয়নি। পূর্ব পাঞ্জাব থেকেও কোনও তরুণী বা কিশোরী

মুসলমান মেয়েকে পশ্চিম পাঞ্জাবে আসতে দেওয়া হয়নি। লাখ লাখ মেয়ে ওই সময় অপহৃতা, লুণ্ঠিতা ও ধর্ষিতা হন। পাঞ্জাবী সৈন্যরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মেয়েদের ওপর ১৯৪৭ সালের পাশবিকতার পুনরাবৃত্তি করে। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছিল তার কোনও বিচার হয়নি। যুদ্ধাপরাধের জন্য পাকিস্তান আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেনি। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান চীন ও কোরিয়ায় যে গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালিয়েছিল সে জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত বারবার দুঃখ প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেও তা পায়নি। জাপানের পাঠ্যপুস্তকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করায় এখন জাপানকে তার পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করতে হচ্ছে। এ বিষয়ে চীন বা কোরিয়া আজও জাপানকে ক্ষমা করেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসী বাহিনীর স্পেশাল ফোর্স 'গেস্টাপো' কর্তৃক ব্যাপক ইহুদি বুদ্ধিজীবী নিধনের সঙ্গেও একাত্তর সালে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের গোলাম রাজাকার আলবদর বাহিনীর বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী নির্যাতন ও নিধনযজ্ঞের অপূর্ব মিল রয়েছে। জার্মানিতে এবং জার্মান অধিকৃত ইউরোপ ও সোভিয়েট রাশিয়ায় যে সুনিপুণভাবে ইহুদি বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের চিহ্নিত, অপহরণ, নির্যাতন ও নিধন করা হতো সে নীল নকশা অনুযায়ী পাকিস্তান বাহিনী তাদের এদেশীয় দালালদের সহায়তায় বাঙালি বুদ্ধিজীবী রাজনীতিক, ছাত্র, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, কবি, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সৈনিক, পুলিশ, আনসার, ফায়ার সার্ভিসের কর্মী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাজীবীদের যেভাবে নয় মাস নির্বিচারে হত্যা করেছে সে কাহিনী আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। যেমন রচিত হয়নি পাকিস্তানিদের গণহত্যা, বধ্যভূমি, বন্দি শিবির এবং নারী নির্যাতন বা কোটি খানেক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ও শরণার্থীর ইতিহাস লেখা হয়নি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা লেখা বা সংকলিত হয়েছে তা হচ্ছে মূলত দলিলপত্র সংকলন এবং নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধের ইতিহাস, যার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনের কথা। কিন্তু যে যুদ্ধ ছিল জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, তাতে সাধারণ মানুষের যে যুদ্ধ, যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ এবং সর্বাত্মক সংশ্লিষ্টতা সে ইতিহাস তো লেখা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা তো আমাদের দেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্যসূচির মধ্যে নেই। ফলে নতুন প্রজণ্ম জানতে পারছে না একটি জাতি রাষ্ট্র, একটি স্বাধীন দেশের জন্য তাদের পূর্বপুরুষদের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য, পূর্ণাঙ্গ এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের অভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শত্রুমিত্রের কথাও বর্তমান প্রজণ্ম জানতে পারছে না; তারা জানতে পারছে না কারা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আর কারা পাকিস্তানের দালাল বা রাজাকার ও আলবদর। ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত জরুরি মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজাকারদের ইতিহাস রচনা করা যাতে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজণ্ম জানতে পারে তাদের পূর্বপুরুষদের কে মুক্তিযোদ্ধা আর কে রাজাকার ছিলেন। অন্যথা ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস আর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালনের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে কিংবা মার্চ ও ডিসেম্বর মাস এলেই প্রচার মাধ্যমে দায়সারা গোছের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হতে বাধ্য। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পাকিস্তানিদের 'জেনোসাইড' বা 'গণহত্যা' এবং 'এথনিক ক্লিনসিং' বা বাঙালি জাতিকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নৃশংস, বর্বর, পৈশাচিক অভিযান কিন্তু এ পর্যন্ত তার কোনও ইতিহাস লেখা হলো না। এখন প্রশ্ন হলো এই সব ইতিহাস কে বা কারা লিখবেন? মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব হয়তো পেশাগত ঐতিহাসিকদের কিন্তু গত ৩৫ বছরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধের ওপর ইতিহাস জাতীয় যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশের লেখক ঐতিহাসিকগণ নন। প্রসঙ্গক্রমে বাংলার ইতিহাস নিয়ে বঙ্গিমচন্দ্রের সেই

অঐতিহাসিক উক্তিটির কথা মনে পড়ে যায়, ‘বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়। ... বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালি তাহাকেই লিখিতে হইবে।’ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

রফিকুল ইসলাম: প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক।